ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপ দীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ-৯৪৩৪৫৭০১৩০

বর্ষ-১১ সংখ্যা - ১ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০১৪ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

কোলেসটেরোল ও হৃদরোগ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট মানবজাতির অন্যতম ঘাতক হিসাবে উচ্চ রক্তচাপকে চিহ্নিত করেছে। প্রতিবছর এই কারণে ৯৪ লক্ষ ভারতীয়ের মৃত্যু হয়। গড়ে শতকরা ২১ জন ভারতীয় এই উচ্চ রক্তচাপের রোগী। এই সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ভারতে ৪৩০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, 'হুর' সমীক্ষা জানাচ্ছে ভারতে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ৩২ ভাগ নারী উচ্চ রক্তচাপের শিকার।

রক্তসঞ্চালনতন্ত্রের রোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ বা 'সিভিডি' মার্কিন দেশের এক নম্বর হত্যাকারী ব্যাধি। প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ১০ লক্ষ বা কমবেশি আমেরিকান মারা যান। আমেরিকানরা তাদের ডলারের বরাদ্দের প্রায় অর্ধেকই রেঁস্তোরার খাদ্যে ব্যয় করে থাকে। সিভিডি বা সিএইচডি (করোনারী হার্ট ডিজিজ) উভয়ের ক্ষেত্রেই কোলেস্টেরোলের ভূমিকা বিশাল। সে কী পরিচালক, নায়ক নাকি খলনায়ক!

হার্টফেলের কোন ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ নেই। হৃৎপিন্ডের লাবডুব বন্ধ হওয়ায় নেই কোন কোটা কোন সংরক্ষণ, ভারতেই প্রতিবছর হার্টফেলে মারা যাচ্ছেন গড়ে তিরিশ

এরপর 2 পাতায়

মেশিন জলের ব্যবসা

ডট পেনের আবিষ্কার হওয়ার পর কাগজে একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ পেত এমন একটি পেন পৃথিবীতে তৈরী হয়েছে। যার কালি উপচে পড়ে আপনার সুন্দর জামার পকেটকে কালিমালিপ্ত করবে না যদি প্লেনে চেপে বেড়াতেও যান। অথবা জলের তলায় ডুব দিয়ে লিখতে পারবেন এই পেনে। সত্যি আজ কিন্তু তা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু আপনার জানা অত্যন্ত জরুরী বহুদিন আগে থেকেই প্রকৃতি বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। এখন বর্তমান সংস্কৃতি 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'

এরপর 6 পাতায়

বিস্মৃত প্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী

সর্পবিজ্ঞানী - অবনীভূষণ ঘোষ

একদা প্রখ্যাত সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'যদি সাপ বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং সে প্রয়োজন আমার মতে জরুরি, তা হলে সর্প-বিশেষজ্ঞ অবনীভূষণ ঘোষের সরল ভাষার ছাত্রপাঠ্য বই 'সাপের কথা' পাঠ্য নির্দিষ্ট হয় না কেন? অজ্ঞ লেখকরা এ বই থেকে টুকেও তো লিখতে পারেন? বাংলার ঘরে ঘরে এই বই স্থান পাবার উপযুক্ত এবং তার প্রয়োজন আছে মনে করি।' (এককলমী, ইতশ্চেতঃ যুগান্তর ২৪.১২.১৯৭২)

বিজ্ঞান- প্রেমী সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে বই সম্পর্কে বলেছেন এবং এর লেখক একালে মোটেই পরিচিতি নন। একালে বিজ্ঞান প্রসার ও প্রচারে ধর্মীয় বুজরুকির বিরুদ্ধে বা কুসংস্কার দূর করতে গ্রামে-গঞ্জে নানা বক্তৃতা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ করে অনেকেই প্রচুর বাহবা পাচ্ছেন। বলতে গেলে, দেশের তৃণমূলস্তরের অধিকাংশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনকে যিনি বিজ্ঞানমনস্কতার আলোকে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর নামই একালের অনেকের জানা নেই। তিনি ছিলেন এসবের আদিগুরু। সারা জীবন তিনি বাংলার জল-জঙ্গল ঘুরে নিজের আকণ্ঠ জ্ঞান পিপাসা আর অসাধারণ বিজ্ঞানমমস্কতা নিয়ে অশিক্ষিত, কুসসংস্কাচ্ছন্ন দেশবাসীকে বিজ্ঞান সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এরপর 4 পাতায়

মহাবিশ্বে বিপন্ন তারাজগত

পৃথিবীর কি কোনো ঠিকানা আছে? এমন একটা প্রশ্ন হঠাৎ করা হলে প্রথমে অনেকেই থতমত খেয়ে যাবে। একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে আমাদের মত পৃথিবীরও একটা ঠিকানা আছে। মহাবিশ্বের নিরিখে এই ঠিকানা ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা। আর ছায়া পথের নিরিখে সৌরজগত। নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে কেমন এই ছায়াপথ? মহাবিশ্বে যে কোটি কোটি তারাজগত (গ্যালাক্সি) রয়েছে তার একটি হল এই ছায়াপথ। আকৃতি কুণ্ডলিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা

এরপর 8 পাতায়

ডাব-নারিকেল সমাচার

জল-সংকট। শুদ্ধ পানীয় জল আশা করাই যায় না। কী আকাশের, কী ভূগর্ভস্থ জল সবই। সবই কম বেশি দূষিত। তাই তো রাস্তার ধারে, দোকানে দোকানে, ভ্যান রিক্সায় ডাব। মানুষজনও তাই পান করছেন। অনেকে হয়ত বিশুদ্ধ জল বলে পান করেন আবার কেউ শরীর, মানে পেট ঠান্ডা রাখার জন্য পান করেন। সাধারণরা তলিয়ে দেখেন না অন্য কোন কারণ এর পেছনে আছে কিনা।

সংবাদ মাধ্যম একবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল ডাবের জল পান নয়, উৎপদিত হোক নারিকেল। কারণ নারিকেল শাঁস পুষ্টিকর। তার ছোবড়া, মালা ও গাছের ডাঁটা-পাতা দিয়ে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প

এরপর 6 পাতায়

কোলেস্টোরেল ও হৃদরোগ

1 পাতার পর

লক্ষ। এইসব সাত পাঁচ ভেবে কোলেস্টেরোল নিয়ে আলোচনায় ডুব দিতে চাই।

কোলেস্টেরোল দেহাকাষের জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপাদান—ঘরের দেওয়ালের পলেস্তারা। স্নায়ুকে অপরিবাহী (ইনসুলেট) করে, কতিপয় হরমোনের নির্মাণের ভিত্তি। লিভারের এটা লাগে পিত্তরস (বাইল) তৈরিতে। খাদ্য থেকে শতকরা কুড়ি এবং বাকি আশিভাগ দেহের অভ্যন্তরে তৈরি হয়। প্রাণিজ খাদ্য থেকে কোলেস্টেরোল পাওয়া যায়। কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ রক্তের কোলেস্টেরোল বহন করে নিয়ে যায় হাইডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (বা এইচ ডি এল কোলেস্টেরোল) ধমনী থেকে লিভারে— যেখানে শরীর থেকে নিকাশ হয়। ভাল কোলেস্টোরোল বলে। লোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (বা এনডিএল কোলেস্টেরোল রক্তের প্রধান কোলেস্টোরোল বাহক এবং যখন বা যদি এর পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে তখন তা ধমনীর দেওয়ালে মাছের আঁশের মত প্লেক তৈরি করে। অ্যাথারোমেটাস প্লেক বলে— 'থ্রম্বাস' নামেও পরিচিত—এর থেকেই 'থ্রম্বসিস' শব্দটির উৎপত্তি। এই ক্ষতিকর বা খারাপ কাজ করে বলে একে দুর্জন বা মন্দ কোলেস্টোরোল বলে।

ট্রাইগ্লিসরাইড একই পরিবারের। খাদ্যের অন্তর্নিহিত ফ্যাট থেকে বা শ্বেতসার তথা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য থেকে তৈরি হয়। খাদ্যের মাধ্যমে যে ক্যালরি আমরা পাই তা যদি শরীর তার কোষকলায় কাজে লাগাতে অসমর্থ হয় বা যদি উদ্বৃত্ত হয় তখন তা ট্রাইগ্লিসরাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তখন তা দেহের ফ্যাটকোষের (অ্যাডিপোজ টিস্যু) মধ্যে জমা হতে থাকে। এইভাবে শরীরে মেদের জমা হওয়া শুরু। হরমোন ফ্যাটকোষ থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড মুক্ত করার জন্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয়, যদি এই খাদ্যগ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে এনার্জি বা শক্তি দরকার হয়। সেই সময় ঐ ট্রাইগ্লিসারাইড ব্যয় হওয়ার সুযোগ থাকে। এখন খাদ্যাভ্যাস যদি এমন হয় যে জমা থাকা ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে নয়, পুনরায় জোগানো খাদ্য থেকেই আবার সুলভ ট্রাইগ্লিসারাইড যুক্ত হতে থাকে তখন ব্যাঙ্কের জমা সুদের ওপর আরো সুদ জমতে থাকে। অন্যদিকে পরিশ্রম যদি খাদ্যের অভ্যন্তরের শক্তি বা ক্যালরিকে সম্পূর্ণ খরচ করে ফেলতে পারে তাহলে উদ্বৃত্ত হয়ে তা ফ্যাট কোষের অন্দরে জমা হবার সুযোগ পায় না। উপবাস বা দুই খাদ্য গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে (লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষার রক্ত টানার জন্য ১২ ঘন্টা সময় নেওয়া হয়) ভিএলডিএল (বা ভেরিলোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন) সামগ্রিক রক্তের কোলেস্টোরোলের পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ দখল করে থাকে, ট্রাইগ্লিসারাইডকে দোসর করে। নির্দিষ্ট পরিমানের চেয়ে রক্তের এলডিএল-এর দখল বেশি হলে অ্যাথারোশক্লোরোসিসের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে ভালো হয় নির্দিষ্ট উচ্চমাত্রার এইচডিএল এবং নির্দিষ্ট নীচুমাত্রার এলডিএল। ধূমপান (সিগারেট) রক্তনালির দেওয়ালের ক্ষতি করে এবং তা থেকে এইচডিএল কোলেস্টেরোলের মাত্রা বা পরিমান কমিয়ে দিতে পারে পনেরো শতাংশ বা তার বেশি। ধূমপান ক্ষনিকের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধি করে থাকে তিরিশ মিনিট সময়কাল ধরে এবং আরো বেশি ক্ষতিকর মুক্তমূলক (বা ফ্রির‍্যাডিক্যাল) তৈরি করে। বসা কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের (সিডেন্টারি) জীবনশৈলী 'এইচডিএল' কোলেস্টেরোল কমিয়ে দিয়ে থাকে। শ্বাস ঘন ঘন হয় এমন সমস্ত ব্যায়ামই শারীরিক পরিশ্রম (একনাগাড়ে আশিটা সিঁড়ি ভেঙে হেঁটে ওঠা) এইচডিএল কোলেস্টেরোলের পরিমান বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এমনকি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দ্রুত গতির হাঁটর ব্যায়াম রক্তনালির সঞ্চালনতন্ত্রকে দুরন্ত সাহায্য করে। প্রতিদিন তিন কিলোমিটার হাঁটা থেকে এক হাজার থেকে বারোশ কিলোক্যালরি প্রতি সপ্তাহে দহন করতে পারে। (প্রতি গ্রাম ফ্যাট থেকে আয় নয় ক্যালরি হিসাবে একশোবাইশ থেকে একশো-তেত্রিশ গ্রাম ফ্যাট কমে যাবে, যদি খাওয়ার পরিমাণে তারতম্য না ঘটে)। মোটা বা গোলগাল বা গোপাল গোপাল ভাব বা মেদবহুল হওয়া কালক্রমে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। দেহের বর্ধিত ওজনের (খুব সোজা হিসাব দৈহিক উচ্চতকে ইঞ্চিতে নিয়ে প্রতি ইঞ্চিতে প্রতি কেজি মাপ নিরাপদ; আরো নিরাপদ বিএসআইকে বইশে রাখতে পারলে; উচ্চতাকে মিটারে বদল করে তার বর্গ করতে হবে—দেহের ওজনকে ঐ বর্গ দিয়ে ভাগ করলে বিএসআই পাওয়া যাবে। যদি তা পঁচিশ-ছাবিশ হয় তখন তাকে 'কসমেটিক ওভারওয়েট' বলা হয়। অর্থাৎ আর ওজন বাড়ানো যাবে না। দেহের বর্ধিত ওজন প্রতি কেজি কমলে তা রক্তচাপ কমায় এক মাত্রা বা পয়েন্ট) মাত্র দশ শতাংশ ওজন যদি কমানো যায় তাহলেই ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টেরোল এর মাত্রায় নিরাপত্তা দেবে। ডায়াবেটিস মেলিটাস (টাইপ টু) ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এইচডিএল কোলেস্টেরোলের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ঈস্ট্রোজেন হরমোনের অপ্রতুলত ও মেনোপজ হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মেনোপজ 'এলডিএল' কোলেস্টেরোলকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা প্রদানকারী 'এইচডিএল' কোলেস্টেরোলকে কমিয়ে দেয়। পুষ্টিবিজ্ঞান সম্মত খাদ্যাভাস (একমাত্র নিউট্রিশানিষ্টই এ ব্যাপারে পরামর্শদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতম) এবং শারীরিক পরিশ্রম সম্মত জীবনচর্যা দুশ্চিন্তা কমিয়ে দিতে সাহায্য করে এবং এই যুগলবন্দি রক্তের কোলেস্টেরোল ও ট্রাইগ্লিসারাইড় মাত্রাকে নিরাপত্তা দিতে কার্যকরী ও সমর্থ। ট্রানসফ্যাট হল হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ তেল এদের বর্জন করাই শ্রেয় এর একটি মোহময়ী ক্ষমতা আছে তা হল এটি দিয়ে তৈরি খাদ্যকে দুরন্ত স্বাদ ও গন্ধ এনে দিয়ে থাকে। খাদ্যের মাধ্যমে যে কোলেস্টেরোল গ্রহণ করি তার পরিমান হতে হবে তিনশো মিলিগ্রাম।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের স্টাডি থেকে দেখা গেছে রক্তে উচ্চতর মাত্রায় লোহা থাকার জন্য হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। লোহা খারাপ কোলেস্টেরোল বা এলডিএল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তা থেকে ধমনী গাত্রে ফ্যাটি অ্যাসিড জমে থাকে। অন্য নাম আর্টারিওসক্লেরোসিস বা অ্যাথারোসক্লেরোসিস যে পদার্থটি জমে তার নাম অ্যাথারোমা বা থ্রম্বাস। মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের সময় যে রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে তার মাধ্যমে লোহা নির্গত হয়ে য়ায় বলে হার্টঅ্যাটাক তথা হৃদরোগের ঝুঁকি কম থাকে মেনোপজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত। অন্য ব্যাথা প্রকৃতি নারীকে মাতৃত্বের গৌরব বা দায় নিতে বাধ্য করার জন্য এই বিশেষ ছাড় দিয়ে রেখেছে। রিসার্চ স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে সমস্ত মহিলা ঈস্ট্রোজেন নিয়ে থাকেন (এইচ আর টি-র মাধ্যমে) মেনোপজের পরেও, তাদের ক্ষেত্রে করোনারী হার্ট ডিজিজ (বা সিএইচডি) থেকে ঝুঁকি কমে যায় ষাট শতাংশ। অনুমান এমন হতে পারে যে ঈস্ট্রোজেন ভাল কেলেস্টেরেল শোষণ করে ফেরি করে নিয়ে যায় লিভারে।

এরপর 3 পাতায়

কোলেস্টোরেল ও হৃদরোগ

1 পাতার পর

মানব দেহের স্থাপত্যশৈলী নিয়ে প্র-না-বির 'চোখে আঙুলদাদা' এক আশ্চর্য কৌতুকহাস্যের রসমালাই তৈরি করেছে কিন্তু আসলে তা আরো অনেক নৈপুন্যের অপার মহিমার নিদর্শন। কোন প্রত্যঙ্গ অবাঞ্ছিত বা অতিরিক্ত নয়। জৈব রাসায়নিক ব্যবস্থার কোন কোষ কোন জৈব উপাদান অপ্রয়োজনীয় নয়। কোলেস্টেরোল উপাদানটির কোন কাজ না থাকলে তার অস্তিত্ব থাকতো না। কোলেস্টেরোল বেড়ে গেলে কেউ কেউ আঁৎকে ওঠেন,যেন কোলেস্টেরোল অবাঞ্ছিত! বিষয়টি খোলসা করা দরকার। বাসস্থানের ঘরের যেমন সিমেন্টের প্লাস্টার দেওয়া দেওয়াল থাকে, মানব দেহের তিন লক্ষ কোটি কোষেরও প্রতিটির মেমব্রেন বা আচ্ছাদন ফসফোলিপিড প্রোটিন এবং কোলেস্টেরোল দিয়ে তৈরি। প্রোটিন ভেসে থাকে ও উৎসেচক (বা এনজাইম) হিসাবে কাজ করে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কোষে বা গ্রাহক কোষে বহন করে নিয়ে যায়, এইভাবে কোলেসটেরোল দেহ তরলের স্বাভাবিক কাজের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নেয়। মৌমাছিও এমন কাজ করে ফলসৃষ্টিতে। দ্বিতীয় বড় কাজটি চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢোকার মত, প্রিকারসর এর ভূমিকা, যখন তাকে কর্টিকোস্টেরোন, অ্যালডোস্টেরোন ও যৌন হরমোনের মত কতিপয় হরমোনের জন্য 'বরণের' কাজটি করতে হয়। সবশেষে কোলেস্টেরোলকে বাইল বা পিত্তরস তৈরিতে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হয় এর মধ্যে লিভারের জঠর থেকে দুটি সংশ্লেষিত হয় স্থানীয় কোলেস্টেরোল থেকে এবং প্রাথমিক বাইল সল্ট হিসাবে পরিচিত, উৎপাদিত ঐ পিত্তরস লিভার থেকে সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত্রে অথবা গলব্লাডারের মত পিত্তথলির মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্তে ঢোকে। এজন্যই গলব্লাডার কেটে বাদ দিয়ে দিলেও বিপদের কারণ হয় না। ক্ষুদ্রান্তে (এখানকার লিপেজ নামের উৎসেচক ফ্যাট্ হজম করায়) খাদ্যের মধ্যের ফ্যাটকে দ্রবীভূত করে এবং তাকে উৎসেচকের পক্ষে রেকাবিতে সাজিয়ে দেওয়া খাবারের মত হজমের কাজটি করার জন্য সুবিধা হয়ে যায়। সেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড দল মিশে যায়। মিশে যাবার সময় কখনো বা ক্ষুদ্রান্তের ব্যাকটিরিয়দের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের পিত্তরস তৈরি হয়ে যায়। উভয় প্রকার পিত্তরসই লিভারের রসায়নাগারে আবার ফিরে যায় নিঃসরণ হবার জন্য। এই রান্না ও পরিবেশন পর্ব সমেত সমগ্র কাজটি প্রতিদিন অন্ততঃ পঞ্চাশবার সমাধান করতে হয় একজন আম আদমির জন্য। ১৪০ গ্রাম কোলেস্টেরোল যে সাধারণতঃ মানব দেহের ভাঁড়ারে জমা থাকার কথা বা জমা থাকে সমুদয় পরিচালন ব্যবস্থার অভিমুখ সেই দিকে থাকে। পাশ্চাত্য দেশের প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণতঃ পাঁচশো মিলিগ্রাম কোলেস্টেরোল (অবশ্যই ফ্যাটের মাধ্যমে) খেয়ে থাকে প্রতিদিন এবং এর চল্লিশ শতাংশ মাত্র শোষিত (বা হজম) হয়, যদি প্রতিদিন ১৫০ মিগ্রা কোলেস্টেরোল খাওয়া হয় তাহলেও শোষণের দক্ষতা শতাংশ হিসাবে কমে যায়। উল্টো দিকে কেউ যদি কম কোলেস্টেরোল খাদ্যরীতি অনুসরণ করে তাসত্ত্বেও কোলেস্টেরোল শোষণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মেরুদন্ডী প্রাণিদের অনেকেই নিরামিষভোজী বা উদ্ভিজ খাদ্যের উপর নির্ভরশীল (অত্যন্ত আনন্দের কথা, নামী দামী দাবা খেলোয়াড় সন্দীপন চন্দ, নিরামিষভোজী, সম্রাট আকবরও নিরামিষভোজী ছিলেন। খবরটা পেয়েছি বাবা সুভাষ চন্দ মহাশয়ের কাছ থেকে। বুদ্ধির খেলা, মস্তিককে এত বেশি পরিশ্রম করতে হয় তা সত্ত্বেও ওর প্রাণিজ প্রোটিন না খেলেও অস্যার্থ রসিক পরিক ভাবুন)। কোথা থেকে আসে তাদের জন্য কোলেস্টেরোল? তা তখন সংশ্লেষিত হয়ে থাকে লিভার

1 পাতার পর

ও ক্ষুদান্ত্রে। উৎপাদিত ঐ কোলেস্টেরোল কোষে কোষে রক্তপ্রবাহে পরিবহন করে নিয়ে যায় ভেরি লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (বা ভিএলডিএল)। লাইপোপ্রোটিনরা তৈরি হয় মূলত ট্রাইগ্লিসারাইড দিয়ে, যাকে ঘিরে থাকে কোলেস্টেরোল, ফসফোলিপিডস্ এবং প্রোটিন।

খাদ্যগ্রহণ শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় জ্বালানির যোগান নয়-খাদ্য এক সামাজিক অনুষ্ঠান উৎসব আড়ম্বর, কী নয়! আনন্দ করতে আমরা উৎসব করি ভোজ দিই, শ্রদ্ধা বা শোক জানাতে উপবাস করি। ভাল খবর, আনন্দ উদ্‌যাপন করতে মিষ্টি বিতরণ করি। ফিলগুড-ফ্যাক্টর (সুখানুভূতি) আনতে নেশা করি, মাদক নিই, আরো কত কী করি-তা করতে গিয়ে মুখরোচক হ্লাদযুক্ত খাদ্য তৈরি করতে গিয়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শত্রু তেল-চিনি-লবন সমৃদ্ধ বস্তু দিয়ে খাদ্য বানিয়ে ভোক্তাকে প্রীত করি, বোকা বানাই—এই দূর্বলতার পথ দিয়েই রোগ-ব্যাধি সিঁধ কেটে মানবদেহে ঢোকে। আমার একটি হাইপোথিসিস ঃ স্ত্রী অতি দক্ষ রাঁধুনি হলে তার স্বামীর যথাকালে হৃদরোগের বুকিং পাখা। রান্না ঘর আসলে একটি বিশাল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী এ ক্ষেত্রে নেই নেই করে অন্তত বেশি কম পঁচিশটি উপাদান ব্যবহার করা যায়। কিন্তু জিভকে খুশী করতে গিয়ে তাকে আমরা হৃদরোগের আঁতুড়ঘর বানিয়েছি। বেশির ভাগ টিভি চ্যানেলের রান্না ঘর বা রান্নার অনুষ্ঠান নিয়ে যে প্রহসন দেখানো হয় সেখানে নানা কায়দায় তেল, ঘি, মাখন, চীজ ডালডা, ক্রীম, মারগারিন, চিনি, লবন, ভিনিগার, চীনা বাদাম, নারকেল, কাজু, আজিনা মটর, দই, ছোট চিংড়ি ইত্যাদি বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার হয়-এসবই মুখরোচক বটে কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। অনেক সময়ই মাংসের পদ রান্না নানা চরিত্র নিয়ে এসে হাজির করানো হয়। এব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে বলি, সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে।

'পান কু'-য়ের বক্তব্য দিয়ে লেখা শেষ করছি। তিনি বলেছেন ব্যাধির বিরুদ্ধে যারা সতর্ক করেন, যারা হুশিয়ারী দিতে পারেন, যারা সঠিক খাদ্য বিচার করে খাওয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারেন তারা অনেক বড় চিকিৎসক। কি খাবেন কেন খাবেন তা পুষ্টিবিদ বা ডায়েটিসিয়ানের কাছে জেনে নিতে পারেন। — *লেখকঃ রণজিৎ পাল, ফ্ল্যাট ফোর বি, উজ্জ্বল অ্যাপার্টমেন্ট,*

১ বি, চন্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০৪০,

দূরভাষঃ ২৪১১-৫৯০৩, চলভাষঃ ৯৮৩১২-০৬৫৪৬।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

২৩ জানুয়ারী বিজ্ঞান দরবারের পরিচালনায় সারা দিন ব্যাপী এক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির মদনপুর বয়সাবিলে আয়োজন করা হয়। শিবিরে কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, কাঁপা, পলাশি, হরিণঘাটা সহ বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ভ্রাতৃপ্রতিম বিজ্ঞান সংগঠনের প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক জগন্ময় মজুমদার, মিঠু বিশ্বাস, তাপস মজুমদার ও কিঞ্জল বিশ্বাস বয়সাবিলে বিভিন্ন উদ্ভিদ (প্রায় ৪৪টি গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন), পাখি, পোকামাকড় ও জলাশয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সহ বয়সাবিলের পাখি ও অন্যান্য পরিবেশ নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন সদস্য সম্রাট সরকার।

সর্পবিজ্ঞানী অবনীভূষণ ঘোষ

1 পাতার পর

এ বিষয়ে লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি বই। এর কয়েকটি ছিল সাপ নিয়ে। তাঁর লেখা বই সম্পর্কেই সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর মন্তব্য আর একনিষ্ঠ প্রচারবিমুখ, অসম্ভব পরিশ্রমী, বিজ্ঞান মনস্ক, অজ্ঞাত প্রায় ব্যক্তিটির নাম অবনীভূষণ ঘোষ।

আত্মপ্রচারে যাঁদের প্রবল অনীহা, তাঁদের জীবনী সংগ্রহ করা একান্তই সমস্যার, বিশেষ করে এদেশে। এই কারণে অবনীভূষণের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যেটুকু সংগ্রহ করা গিয়েছে তা অতি সামান্য। অবনীভূষণের লেখা 'যত খুশী প্রশ্ন করো' বইটিতে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন অতি অল্প কথায় এইভাবেঃ 'অবনীভূষণ ঘোষ (১৯১৪) মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সর্প গবেষণায় খ্যাতি ছিল।' বইটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৮৩তে। সামান্য এই কটি কথায় তাঁর জন্ম বছর পাওয়া গেল ১৯১৪। লক্ষণীয়, তিনি বলছেন 'সর্প গবেষণায় খ্যাতি ছিল'। খ্যাতি ছিল অর্থাৎ অতীতে। আসলে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কোনোভাবে কোনও স্বীকৃতি না পেতেই এই হতাশার অভিব্যক্তি। বিষয়টি ভাববার।

অবনীভূষণের পৈতৃক বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার আন্দুল। তবে তাঁর জন্ম ও ছেলেবেলা কেটেছে শহর কলকাতায়। তাঁর পিতা ছিলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মাতা মেনকাসুন্দরী। ছোটোখাটো জমিদারি ছিল নৃপেন্দ্রনারায়ণের। কলকাতার ভবানীপুরে তাঁদের বাড়ি ছিল। তবে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। আর্থিক কারণে পড়াশুনো বেশি দূর এগোয়নি। সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে। এরপর স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপরই চাকরি করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কলে তিনি এ আর পি-তে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে চাকরির মেয়াদ শেষ। শুরু করলেন সাংবাদিকতা। 'অ্যাডভান্স', হিন্দি 'বিশ্বামিত্র' ও বাংলা 'মাতৃভূমি' কাগজের সঙ্গে কিছুদিন জড়িত ছিলেন।

পরবর্তী সময় দেখা যায়, কলকাতার বই প্রকাশনা সংস্থার অনেকে অবনীভূষণকে চেনেন বই এর লেখক হিসাবে। স্কুল পাঠ্য বিজ্ঞানের বই ও ছোটোদের এনসাইক্লোপিডিয়া ধরণের নানা বই লিখেছেন তিনি। কিন্তু বইগুলিতে তাঁর নাম পাওয়া যাবে না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে বই লেখানো হয়েছে, কোথাও তাঁর নাম ব্যবহার করা হয়নি। সিলেবাসের নিয়ম, নির্দেশ মেনে স্কুল পাঠ্য বই লেখার ব্যাপারে অবনীভূষণ ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। ইংরেজি, বাংলা, ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান—এরকম প্রায় সব বিষয়ে সামান্য দক্ষতার সঙ্গে লিখতেন। মনে প্রশ্ন জাগে, এমনভাবে তিনি বই লিখতেন কেন? এর সঠিক উত্তর জানা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা যায়, অর্থের তাগিদেই তাঁকে এসব করতে হয়েছে। কেননা জীবনের শেষ দিকে তিনি আর্থিক অনটনে দিন কাটিয়েছেন।

প্রসঙ্গত স্কুলের বই লেখা ছাড়া তিনি অন্যান্য ধরণের বইও লিখে গিয়েছেন। তবে অবনীভূষণ একটি স্মরণযোগ্য নাম হতেন না, যদি না এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের সচেতন করতে ভিন্ন ধরণের এক বিজ্ঞান আন্দোলন চালিয়ে না যেতেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে অবনীভূষণের চিন্তাভাবনা ও গবেষণা কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সাপ নিয়ে। কিভাবে একাজে তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন, এর আংশিক উত্তর পাওয়া যায় তাঁরই লেখা 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে' বই থেকে। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখেছেনঃ 'রহস্যময়তা বরাবরই আমাকে আকর্ষণ করেছে। যা কিছু রহস্যময় তা বুঝতে আমি চেষ্টা করেছি। তাকে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক বলে ধরে নেই নি।'

সাপ সম্পর্কে জানতে অবনীভূষণকে নিজ হাতে সাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, সাপুড়ে-ওঝা, গুনিনদের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। আবার অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের বই পুস্তকও পড়তে হয়েছে। এর কারণ ছিল। তাঁর কথায়ঃ 'সাপ সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত রহস্যময় জনশ্রুতির সত্যতা বাছাই করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।' (সাপ, শিক্ষাভারতী)। সাপ সম্পর্কে তাঁর লেখায় সাপের আকৃতি-প্রকৃতি, বিষদাঁত, বিচিত্র ধরণের সব সাপ, সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। তবে অবনীভূষণের বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে সাপ নিয়ে যেসব জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, সংস্কার, কুসংস্কার, গ্রামীন সমাজে একেবারে তাদের জীবনচর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেইগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ, এবং যুক্তি নিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো।

প্রসঙ্গত, অজানা অতীত থেকে মানুষ সাপ নিয়ে চর্চা করে আসছে। অবশ্য সবই যে বিজ্ঞান সম্মতভাবে হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। তবে সাপ যে শুনতে অক্ষম, একথা জনগণকে সাপ সম্পর্কে অবহিত করতে অবনীভূষণ যেভাবে সাপ নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে বই-পুস্তক লিখেছেন এর তুলনা এদেশে আর একটাও আছে বলে জানা নেই। আর একটা কথা হচ্ছে, সাপ নিয়ে পড়াশুনোর কোনো ডিগ্রি অবনীভূষণের ছিল না। নিজের অন্তরের তাগিদে তিনি নিরলসভাবে জীবনভর সাপ নিয়ে গবেষণা করে গিয়েছেন।

অবনীভূষণ তাঁর জিজ্ঞাসু মন নিয়ে যেমন গবেষণা করেছেন, তেমনি করেছিলেন ভূত-প্রেত নিয়ে। ভূত-প্রেত দেব-দেবীর ভর, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ভূমিকা হিসাবে লিখছেনঃ

'প্রতি মানুষই বিচারভিত্তিক বুদ্ধির অধিকারি হলেও সব মানুষই একান্তভাবে তার সাধনা করে না, যাঁরা করেন, তাঁদের বলি আমরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধিই একমাত্র কষ্টিপাথর যাতে এই ঘটনাময় বিশ্বের সমস্ত ঘটনার সত্যমিথ্যা যাচাই হয়, মানুষের সচল সফল কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে এই বুদ্ধি।.. বুদ্ধি হলো যুক্তির রাজ্য। যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ওপর। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিরিখে জ্ঞান পরিণত হয় বিজ্ঞানে। ... বুদ্ধিও বিপথে চালিত হয়। প্রখরতর বুদ্ধি এসে ভুল ধরিয়ে দেয়। ... বিজ্ঞানীর কাছে চরম সত্য বলে কিছু নেই।' ('বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে', — শিক্ষাভারতী, ভূমিকা)। ভূতে পাওয়া, হিস্টিরিয়া, ভূত-প্রেত এসব নিয়ে এদেশের বিশেষ করে গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচলিত নানা অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। অবনীভূষণ এসব নিয়ে তাঁর লেখা 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে' বইতে ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সহজ, সরল ভাষায় সাধারণ মানুষকে এসব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে অবনীভূষণকে মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান—এরকম বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের জটিল তত্ত্ব ও তথ্যকে আলোচনা করতে হয়েছে। ইলুশন, হ্যালুসিনেশন, এপিলেপসি—এসব নিয়েও ভাবতে হয়েছে অনেক। ভূত-প্রেত নিয়ে বলতে অবনীভূষণ লিখছেনঃ 'সচরাচর ভূত দেখি আমরা ভরসন্ধ্যেয় অথবা জ্যোৎস্না রাতে।' নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন 'এর কারণ কি?'

উত্তরে বলছেনঃ—

এরপর 7 পাতায়

ল্যাভয়সিয়ে ঃ প্রথম আধুনিক রসায়নবিদ

শোনা যায় বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস নাকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর হত্যাকারীদের বলেছিলেন— 'আমাকে মেরে ফেলো কিন্তু আমার অঙ্ককে মেরো না।' আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক ল্যাভয়সিয়ে কিন্তু একই রকমভাবে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে এতোটা উদাসীন থাকতে পারেননি। তিনি বরং বিচারকদের কাছে কিছুটা সময় চেয়েছিলেন যাতে নিজের অসমাপ্ত পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি তিনি শেষ করতে পারেন। বিচারক অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো তুচ্ছ কাজের জন্য তাঁর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

অ্যান্থনি ল্যরেন্ট দ্য ল্যাভয়সিয়ের (Antoine-Laurent de Lavoisier) জন্ম ১৭৪৩ সালের ২৬শে আগষ্ট ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে। ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার নিরিখে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যেই স্যার আইজাক নিউটনের জন্মের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মহাকর্ষ সূত্র, ক্যালকুলাস প্রভৃতি সহযোগে পদার্থ বিজ্ঞানে ইতিমধ্যেই সনাতন বলবিদ্যার স্বচ্ছ ধারণা ইউরোপের বিজ্ঞানীমহলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ে প্যারিসের মাজারিন কলেজে অধ্যয়নরত ল্যাভয়সিয়ে যে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবেন সেটাই স্বাভাবিক। অংক, দর্শণ, উদ্ভিদবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি তিনি আইনের ডিগ্রীও লাভ করেন, যদিও ওকালতি তিনি কোনোদিনই করেননি। ফ্রান্স সহ সমগ্র ইউরোপে তখন আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার যেন জোয়ার চলছে। সেই সময় তার হাতে এলো পিয়ের ম্যাকুইরির রসায়ন অভিধান। ইতিমধ্যেই অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ ইটিনি কনডিল্যাক এর একাধিক বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রসায়নচর্চা করে জীবন কাটাবেন বলে একরকম ঠিক করে ফেলেছেন তরুন ল্যাভয়সিয়ে। ১৭৬৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞান পর্ষদে জিপসাম (সোদক ক্যালসিয়াম সালফেট) এর ভৌত ধর্ম সম্পর্কিত গবেষণা প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে রসায়ন গবেষণায় তার যাত্রা শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই সহযোগী হিসেবে পেলেন স্ত্রী মারিকে। ইংরাজী না জানা ল্যাভয়সিয়ের দোভাষী হিসেবে এবং বিভিন্ন সমসাময়িক বিজ্ঞান প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ করে তিনি স্বামীকে সাহায্য করতেন।

বিজ্ঞান গবেষক হিসেবে ল্যাভয়সিয়ের বুৎপত্তি দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। কোনো বস্তুর দহনের জন্য বায়ুর একটি বিশেষ উপাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন। এমনকি জীবদেহে শ্বসন প্রকৃয়াও সে এক প্রকার দহন তাও অত্যন্ত সরল পরীক্ষা দ্বারা ল্যাভয়সিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। হেনরি ক্যাভেন্ডিস আবিষ্কৃত দাহ্য বায়ু (যা প্রকৃত পক্ষে হাইড্রোজেন) ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষায় ব্যবহৃত দহন বায়ু (যা পরবর্তীতে অক্সিজেন নামে পরিচিত হয়; হাইড্রোজেনের মতো এই নামটিও ল্যাভয়সিয়েরই দেওয়া) এর সাথে যুক্ত হয়ে যে জল উৎপন্ন করে সমসাময়িক গণিতবিদ ল্যাপলাস এর সহযোগিতায় ল্যাভয়সিয়ে তা প্রমাণ করেন। তার এই পরীক্ষা থেকে প্রায় ২০০০ বছরের পুরোনো ধারণা যে 'জল একটি মৌল' তা বিজ্ঞানীমহল পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। দহন সম্পর্কিত একাধিক মূল্যবান গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ফ্রান্সের একাডেমি অফ সায়েন্স এর সুপারিশে গানপাউডার কমিশন এর কমিশনার নিযুক্ত হন। দক্ষ সংগঠক ও গবেষক ল্যাভয়সিয়ের উপস্থিতিতে সেই সময় এই কমিশন অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করে এবং সরকারের আয় বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নেয়।

রসায়ন বিজ্ঞানে যেকোনো বিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পরিমান বিক্রিয়কের দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমান বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টিও ল্যাভয়সিয়ে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফ্রান্সের স্কুলগুলিতে ল্যাভয়সিয়ের সূত্র হিসেবে যা পড়ানো হয় তার ইংরাজী তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'Nothing is lost, nothing is created, everything is transformed' ১৭৮৭ সালে সমসাময়িক কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে তিনি ফরাসী একাডেমি অফ সায়েন্স এ রাসায়নিক নামকরণের প্রথা প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন মৌল, অ্যাসিড ও অক্সাইড সহ মূলত অজৈব পদার্থের নামকরণের ব্যাপারে তারা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি যোজ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন যৌগের নামের শেষে 'আস' অথবা 'ইক' শব্দের যে বর্তমান ব্যবহার তাও সেই বিজ্ঞানী দলের প্রস্তাবনা থেকেই গৃহীত।

একাধিক দিক নির্দেশক গবেষণা সহ ল্যাভয়সিয়ে যখন ব্যস্ততম জীবন কাটাচ্ছেন ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৭৮৯ সাল থেকে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা। যেকোনো বিপ্লবেরই মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য থাকলেও তার জন্য সমাজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মূল্যের একটি রূপ অসংখ্য প্রাণ, সামাজিক সম্পত্তি ও ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংস। ১৭৯১ সালে বিপ্লবীরা ফ্রান্সের একাধিক সরকারী সংস্থার কর্মক্ষমতা কেড়ে নেয়। ঠিক তার পরের বছর ল্যাভয়সিয়েকে বাধ্য করা হয় গানপাউডার কমিশন থেকে ইস্তফা দিতে। ১৭৯৩ সালের ৮ই অক্টোবর ফরাসী একাডেমি অফ সায়েন্স সহ প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সমাজের কাজকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যদিও বিপ্লব সম্পর্কে ল্যাভয়সিয়ের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক ধারণা জানা যায় না, তবে সেই সময়কার অধিকাংশ বিদগ্ধ ফরাসী পন্ডিতের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে কোনো ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ। জীবদ্দশায় তার শেষ বড় কাজ ছিল জাতীয় অধিবেশনের মাধ্যমে ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকিকরণের প্রচেষ্টা। এটা মনে করা যেতেই পারে যে সমসাময়িক রাজনৈতিক হিংসা এবং ভয়াবহতাই হয়ত রাজনৈতিক সংস্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও ১৭৯৩ এর ২৪শে নভেম্বর আরো অনেক সরকারী আধিকারিকের মতো তিনিও গ্রেপ্তার হন। ফরাসী রাজনৈতিক এবং আইনজীবী ম্যাক্সিমিলিয়ন দ্য রোবেস্‌ফিয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৭৯৪ সালের প্রথম দিকে এক জাতীয় অধিবেশনে ল্যাভয়সিয়েকে বিশ্বাসঘাতক এবং দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে গণিতবিদ ল্যাগরেঞ্জ সহ আরো কয়েকজন জন্মগত ভাবে বিদেশী বিজ্ঞানীকে সাহায্য এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও ল্যাভয়সিয়ের বিরুদ্ধে করা হয়। অন্যান্য কর সংগ্রাহক অধিকারিকদের সাথে ল্যাভয়সিয়েকেও ১৭৯৪ সালের ৮ই মে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। শোনা যায় বিচার চলার সময় তিনি একবার তার গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম শেষ করার জন্য কিছুটা সময় চাইতে গেলে বিচারক

এরপর 7 পাতায়

মেশিন জলের ব্যবসা

1 পাতার পর

কথাটাকে সম্মান জানিয়ে 'ফেলো কড়ি ভরো জল' এই কথাটি চালু হয়ে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই চেষ্টা করুন না কেন এখন পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ কর্পোরেট হাঙর কুমিরগণ বাজারে নেমে পড়েছেন জল বিক্রির কাজে। তাই বাজারে এখন এসে গেছে ওয়াটার এটিএম। এই এটিএম এর কার্ড কোনো এক বহুজাতিকের কাছ থেকে কিনতে হবে। সারা মাসে কত জল আপনার লাগে তার হিসেব করে টাকা জমা দিতে হবে ও তার বিনিময়ে একটা ডিজিটাল কার্ড ঐ বহুজাতিক কোম্পানী আপনাকে দেবে প্রথমে মেশিনের নির্দিষ্ট খাপে কার্ড ঢুকিয়ে স্ক্যান করে নেওয়ার পর ১ লিটার-৫ লিটার-১০ লিটার-২০ লিটারের বোতাম আছে তা টিপলেই নল দিয়ে জল বেরোতে থাকবে। জল বিশুদ্ধ পানীয় জল কিনা তা প্রশ্ন করবার অধিকার থাকবে না। তার কারণ সরকারী মোহর লাগানো থাকবে এই এটিএম এ। সরকারের তো রেভিনিউ চাই। প্রতি লিটারের দাম ৫টাকা হলে সরকার ১টাকা পাবে। পাড়ায় পাড়ায় বোতল জল তুলে বিক্রি করবার যে ভয়ঙ্কর খেলা শুরু হয়েছে তার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন পৌরসভা বা পঞ্চায়েত। কিন্তু বাণিজ্যিক ভাবে জল তোলা নিষিদ্ধ। জল বিভাজিকা দপ্তর-এর অনুমতি ছাড়াই রমরম করে চলছে এই জল তোলার ব্যবসা।

ওয়াটার এটিএমের উদ্ভাবক হল পিরামল ফাউন্ডেশন এই ওয়াটর এটিএম রাজস্থান, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে তাদের ব্যবসা চালু করেছে। একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে সর্বজল প্রকল্প। এর আগে রাজীব গান্ধী ওয়াটার ফাউন্ডেশন গ্রামে জল দেবার একটা প্রকল্প তৈরী করে। তার নাম ছিল 'সজল ধারা প্রকল্প' (আমরা যারা খারাপ লোক তারা নাম দিয়ে ছিলাম মানুষের চোখের জলের ধারা) কেননা ঐ প্রকল্পে বলা ছিল ১) মাটির তলার জল তোলা হবে। ২) যে ইলেকট্রিক পুড়বে তার দাম গ্রামবাসীকে দিতে হবে। ৩) যে পাইপ খারাপ হবে বা মোটর খারাপ হবে তাও গ্রামবাসীকে দিতে হবে সরকার কোনো দায় নেবে না। অবশ্য পরের কথাটা সরকার উহ্য রেখেছেন যখন গ্রামবাসীগণ তা চালাতে অক্ষম হবেন তখন কোনো বহুজাতিক সামনে সমাজসেবাকে সামনে রেখে কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি বাণিজ্য চালাবেন। বহু সজল ধারা প্রকল্প বন্ধ। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে এই সমাজসেবা।

সর্বজল কোম্পানী জানিয়েছেন যে এই ব্যবসা বেশ লাভজনক। সন্দেহ নেই যে সব এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায়না বা জলের অভাব সেখানে এটিএম জল দারুন ভাবে চলবে। সর্বজল আরো ভাবছে পাউচ প্যাকেটে কি ভাবে বাড়িতে বাড়িতে এটিএম থেকে জল নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু কিছু বেয়ারা প্রশ্ন তো মনের মধ্যে এসে পড়েই বিশুদ্ধ পানীয় জল বিনামূল্যে সরবরাহ করবার দায়িত্ব তো সরকারের। এছাড়া পানীয় জল পাওয়ার জন্মগত অধিকার তো নাগরিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে তবে কেন এই জল এটিএম। তবে কি সরকার স্বাস্থ্য শিক্ষার মত জলও বহুজাতিকের হাতে তুলে দিচ্ছেন? এখন থেকে ভাবতে হবে আর বলতে হবে আমার পায়ের তলার মাটির নিচের জল নিয়ে ব্যবসা হতে দেব না। এই জল আমরা বিনামূল্যে পান করব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

— লেখকঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ-৯৩৩২২৮৩৩৫৬

ডাব-নারিকল সমাচার

1 পাতার পর

গড়ে ওঠতে পারে, নানা লোক কাজ পেতে পারে ও বেকার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ে ওঠতে পারে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে বর্তমান দিনে। নারিকেল চাহিদা মানুষের মধ্যে কমে গেছে। তার কারণ, অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, অধিকাংশ লোক অ্যাসিডিটি, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগে ভুগছেন এবং লিপিড প্রোফাইল এর স্বাভাবিক মাত্রার কমা বাড়া। তাই লোকে নারিকেলের প্রতি আর আগ্রহী নয়। বরং এড়িয়ে চলে। যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ নেই তারাও খায় না অ্যাসিডিটির ভয়ে। আজ অ্যাসিডিটি এমন পর্যায়ে গেছে জল খেলেও কারুর কারুর অ্যাসিডিটি। তারা ডাবের জল ও নারিকেল কোনটাই ছোঁয় না। এ যে দুঃসংবাদ।

ডাবের জল পানের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই ডাবের মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখি কী কী আছে এতে। বিশ্লেষণের পাতা ওল্টালে নজরে পড়ে এই জলে দ্রবীভূত আছে গ্লুকোজ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সাইটোকাইনিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ।

ওই জলের গ্লুকোজ, স্বাদে মিষ্টি, শরীরে পুষ্টি জোগায়, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনিসিয়ায় দৈনন্দিন জীবনে পেশীর ক্রিয়া, হৃৎপিন্ডের ছান্দিক গতি নিয়ন্ত্রণ করে, মল-মূত্র ও ঘামের সঙ্গে যে যে উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তা পূরণ করে। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ গেলার বিকল্প হচ্ছে ডাবের জল পান করা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্য আকাশ পথে উড়ে গেছিলেন এই ডাব নিয়ে, ওষুধ ও পথ্য হিসাবে যা শোনা যায়।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ডাবের জলে, তা হচ্ছে সাইটোকাইনিন। এই সাইটোকাইনিন হরমোন যেমন উদ্ভিদ দেহের পাতার বার্ধক্য বিলম্বিত করে ও কোষ বিভাজনকে উদ্দীপ্ত করে তেমনই মানবদেহে নানা প্রকার জৈবনিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সাইটোকাইনিন উদ্ভিদ হরমোন আর কাইনিন প্রাণী হরমোন। সবই কাইনিন, নাইট্রোজেন যুক্ত। প্রাণী হরমোন থেকে আলাদা করার জন্য হরমোন এর পূর্বে সাইটো যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেহে রক্তরসেতে কাইনিন হরমোন থাকে। এর জৈবনিক কাজ পরীক্ষিত, প্রমাণিত—রক্তস্রোত হার, রক্তচাপ, রক্ত জালিকার ভেদ্যতা ইত্যাদি বজায় রাখে। এছাড়াও দেহে অরেখ পেশী সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। কোন জীবানু ঘটিত আক্রমণে এই কাইনিন হরমোন প্রদাহের সৃষ্টি করে।

তাই ডাবের জল পান শরীরে অতি উপকারী। সেজন্য ডাবের গাছের বনাঞ্চল সৃষ্টি জরুরি। যদিও বর্তমানে নানা প্রকার অপ্রাকৃত দ্রব্য নিয়ে শিল্প গড়ে উঠেছে। তাই নারিকেলের বা তার গাছের নানা অংশ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তথাপি নারিকেল ডাব গাছ আরও লাগাবার প্রয়োজন। শুধু তাই নয় নারিকেল দুধ খুবই পুষ্টিকর। যা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নানাভাবে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। নারিকেলের খাদ্যমূল্য শতকরা হিসাবে প্রোটিন ০.৯০ চর্বি ৭.১০, গ্লুকোজ ১.৮০, খণিজ লবন ০.৫৫ ভাগ। প্রায় মানব শরীরে মাতৃ দুগ্ধের মত। যারা মাতৃদুগ্ধ পান করতে পায় না নারিকেল দুধ ও গাই দুধ মিশিয়ে তাদের খাওয়ান যেতে পারে।

— কানন কুমার প্রামাণিক, নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
চলভাষঃ ৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

সর্পবিজ্ঞানী অবনীভূষণ ঘোষ

4 পাতার পর

'ভর সন্ধ্যেয় বা জ্যোৎস্না রাতে থাকে অস্পষ্ট আলো—আলো অন্ধকারে মেশানো। এই আলো অন্ধকারের ঝিলিমিলিতে আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগে। এক জিনিসকে আর এক জিনিস ভাবি। ভুল দেখি, ভূতও দেখি।'

ভূতের রহস্য ভেদে তিনি একই বইতে লিখছেন ঃ

'শহরের ইলেকট্রিক আলোকে ভূতে যেমন ভয় করে, তেমনি ভয় করে জনাকীর্ণ লোকালয়কে। ইলেকট্রিক আলো মানে উজ্জ্বল আলো এবং এতে যে কোনো বস্তুর প্রকৃত চেহারা বুঝতে সুবিধা। আর বহু মানুষের যেখানে সমাগম হয় সেটিই লোকালয়। কোনও কিছু একজনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যতটা সম্ভব, অনেককে একটা সঙ্গে ফাঁকি দেওয়া প্রায় অসম্ভব।' (বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে')

হাত দেখা, জ্যোতিষ, ভবিষ্যৎ গণনা—এসব নিয়েও অবনীভূষণের চিন্তাভাবনার ত্রুটি ছিল না। তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি হাত দেখা, কোষ্ঠী-বিচার, রত্ন-পাথর ধারণ ইত্যাদি ছাড়াও গণনার পন্থা হিসাবে বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর লেখা বইতে (বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে')। পথে ঘাটে ভাগ্য গণনার কৌশল যেমন ঃ পাখি, গরু, কুলোর ঘুরে যাওয়া— ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেছেন তিনি। এগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও নিয়েছেন।

অবনীভূষণ লিখে গিয়েছেন নানা ধরণের বই ঃ সবগুলির হদিশ কখনও পাওয়া যাবে না। কয়েকটি বই যেমন ঃ 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে', 'সাপ', 'সাপের কথা', 'যতসব সাপের গল্প' 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী' 'ডাক্তার আসার আগে', 'এগিয়ে চলে মানুষ', 'ভূত ভূত নয়', 'যেমন খুশী প্রশ্ন করা', 'শিশুদের হিতোপদেশ' ইত্যাদি। অবনীভূষণের এইসব বইগুলির মধ্যে 'সাপের কথা', 'ডাক্তার আসার আগে'—এরকম আরও কয়েকটি বই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল বলে জানা যায়।

তবে দুঃখের বিষয়, অবনীভূষণের শেষ জীবন কেটেছে অত্যন্ত কষ্টে— একেবারে অবহেলিত দশায়। তিনি ছিলেন চিরকুমার। নিজের সংসার বলতে কিছু ছিল ন। অনাহার, অযত্নে, একেবারে অবহেলিত দশায় তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে সম্ভবত ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রতিবেদক বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেননি তাঁর মৃত্যু দিনটি। কী পরিমাণ অবহেলিত অবস্থায় তাঁকে শেষ দিনগুলি কাটাতে হয়েছে এ থেকেই তা স্পষ্ট।

পরিশেষে দুঃখ ও পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও এদেশে গ্রামগঞ্জের অগণিত মানুষকে সাপের কারণে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তেমন গুরুত্ব নিয়ে দেখা হয় না। এই কারণেই সাপের বিষের জীবনদায়ী ওষুধের আজও অভাব দেখা যায় গ্রামগঞ্জের হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন জীবনব্যাপী যিনি দরিদ্র গ্রামবাসীদের কুসংস্কার দূর করতে, সাপ সম্পর্কে বা ভূত-প্রেত নিয়ে সচেতন করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাঁকে শেষ জীবন কাটাতে হয়েছে চরম অবহেলিত, উপেক্ষিত দশায়। এই জন্যই কি এই বিজ্ঞানসেবীকে একেবারে দারিদ্র্যে, বিনা চিকিৎসায় কলকাতা শহরের বুকে হাজরা রোডের (৭০১) এক জীর্ণ মলিন ঘরের ভাঙা তক্তপোশে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছিল? তবে অবনীভূষণ যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গিয়েছেন, তর শিখা আজও অব্যাহত।

লেখক ঃ রণতোষ চক্রবর্তী, ফোন ঃ (০৩৩) ২৫৪২১১৬৭

ল্যাভয়সিয়ে

5 পাতার পর

তার কথার মাঝেই তাকে থামিয়ে দিয়ে যা বলেন তার মর্মার্থ এই যে 'প্রজাতন্ত্রের কোনো বিজ্ঞানী বা রসায়নবিদের প্রয়োজন নেই; আর এই বিচার পদ্ধতি কোনো ভাবেই দীর্ঘায়িত করা যাবে না। বিচারে তাকে ফরাসী কোষাগার তছরূপ, শহরে সরবরাহিত পানীয় জলকে ইচ্ছাকৃতভাবে তামাকজাত দ্রব্য দিয়ে দূষিত করা, বিদেশী শত্রুদের অর্থ সাহায্য করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দূর্বল করে দেওয়া সহ আরো অনেক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারের দিনই আরো ২৭ জন সহকর্মীর সাথে ল্যাভয়সিয়েকেও গিলেটিনে হত্যা করা হয়। তার এই বিচর সম্পর্কে বন্ধু গণিতবিদ ল্যাগবেঞ্জ পরবর্তীতে মন্তব্য করেছিলেন — 'আসলে এই মস্তকছেদনের জন্য বিচারকদের কেবল একটি অজুহাতের দরকার ছিল, এবং পরবর্তী একশ বছরও হয়ত এইরকম একটি মস্তিষ্ক তৈরী করার জন্য যথেষ্ট হবে না।'

মৃত্যুর এক বছর পর ফরাসী সরকার ল্যাভয়সিয়েকে সবরকম অভিযোগ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে এবং তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তার বিধবা স্ত্রী মারিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় উল্লেখ করা হয়— 'To the widow of lavoisier, who was falsely convicted'

মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পর ফরাসী সরকার প্যারিস শহরে ল্যাভয়সিয়ের মূর্তি স্থাপন করে। যদিও পরবর্তীতে জানা যায় মূর্তির মুখবয়ব ল্যাভয়সিয়ের পরিবর্তে বরং কনডোরসেট এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, যিনি ল্যাভয়সিয়ের জীবনের শেষ বছরগুলিতে ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সম্পাদক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মূর্তিটি গলিয়ে ফেলা হলেও আজ অবধি সেখানে পুনরয় স্থাপিত হয়নি। তবে প্যারিসে একটি প্রধান হাইস্কুল এবং একটি রাস্তার নাম ল্যাভয়সিয়ের নামে করা হয়; তাছাড়া পরবর্তীকালে লুভর মিউজিয়ামের কাছে হোটেল দ্য ভিলেতে তার মূর্তি স্থাপিত হয়। ইকেল টাওয়ার যে বিখ্যাত ৭২ জন ফরাসী স্থপতি, বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদের নাম খোদিত আছে সেখানে ল্যাভয়সিয়ের নামও দেখা যায়।

রসায়ন গবেষণায় তিনি নতুন যৌগ, মৌল বা কোনো বিখ্যাত যন্ত্র আবিষ্কার না করলেও রসায়ন গবেষণায় পরিমানগত এবং গুনগত পরিমাপের গুরুত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আধুনিক রসায়নকে প্রায় সমউচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যেখানে অষ্টাগশ শতকে পদার্থবিদ্যা ও গণিত গবেষণা পৌঁছেছিল। ১৯৯৯ সালে ল্যাভয়সিয়ের কাজকে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি (American Chemical Society), ফরাসী কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি 'International Historic Chemical Land Mark' বলে স্বীকৃতি দেয়। তবে ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি খোদ ফ্রান্সেও ল্যাভয়সিয়ের নামে আজ পর্যন্ত কোনো জার্নালের নামকরণ হয়নি। এমনকি একওয়ার্ড গ্রিমক্স ছাড়া কোনো বিজ্ঞান ঐতিহাসিকও তার সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেনি। দেশের রাজনৈতিক সংকট এবং হিংসায় বলি প্রদত্ত আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জনক ল্যাভয়সিয়ে প্রকৃত অর্থেই মানব সভ্যতার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া একটি নাম।

— লেখক ঃ ড. অমিতাভ চক্রবর্তী, রসায়ন শিক্ষক,
শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাই স্কুল, কোচবিহার, ফোন ঃ-৯৪৩৪৩৭৭০৬৭

মহাবিশ্বে বিপন্ন তারাজগত

1 পাতার পর

অনুযায়ী এর মধ্যে আছে দশ হাজার কোটি থেকে পনেরো হাজার কোটি নক্ষত্র। ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হল এক লক্ষ আলোকবর্ষ, আর প্রস্থ হল ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ (আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। এক আলোকবর্ষ মানে এক বৎসরে আলো যতটা পথ অতিক্রম করে)। আশ্বিন-কার্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষে রাতের আকাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিস্তৃত যে আবছা আলোর সুবিশাল পথ দেখতে পাওয়া যায় তা ছায়াপথের একটি অংশ মাত্র। আমাদের সৌরজগত এই ছায়াপথের প্রান্তের দিকে অবস্থিত। অর্থাৎ বলা যায় আমরা হলাম ছায়াপথের এক শহরতলীর বাসিন্দা।

এই সুবিশাল ছায়াপথকে সম্পূর্ণভাবে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কোনো প্রযুক্তি আমরা এখনও তৈরি করতে পারিনি যার সাহায্যে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ছায়াপথকে দেখা যায়। বাড়ির ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বাড়িটাকে যেমন দেখা যায় না, এটাও অনেকটা সেরকম। বাড়িটাকে দেখতে হলে বাড়ির বাইরে আসতে হবে। তেমনি ছায়াপথকে দেখতে হলে আমাদের ছায়াপথের বাইরে যেতে হবে অথবা অন্য কোনো পড়শী তারাজগতে বসে দেখতে হবে। যেমন আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী তারাজগত 'অ্যানড্রোমিডা'-কে আমরা ছায়াপথ থেকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাই। আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখে একে একট আলোর পিণ্ডের মত দেখতে লাগে। ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ। এছাড়াও আমাদের আরও দুটি প্রতিবেশী তারাজগত আছে। এরা হল 'ম্যাগেলানিক' (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র) মেঘপুঞ্জ দক্ষিণ গোলার্ধে সান্ধ্য আকাশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। ছায়াপথ থেকে এদের দূরত্ব দু'লক্ষ আলোকবর্ষের মত। দূরত্বের বিচারে এই দুটি তারাজগতকে ছায়াপথের নিকটতম পড়শী বলা যেতে পারে।

১৯৯৪ সালের আগে পর্যন্ত এমনই ধারণা ছিল। তিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এম আরউইন, জি গিলামোর এবং আর ইবাতা ঐ বছরেই একটি নতুন ছোট তারাজগতের সন্ধান দেন। 'ম্যাগ ডেগ' নামের এই ছোট্ট তারাজগতটি ছায়াপথ থেকে মাত্র আশি হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই আবিষ্কারের ফলে ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশীর আসনটি ম্যাগেলানিক মেঘপুঞ্জের কাছ থেকে সরে ম্যাগ ডেগ-এর কাছে চলে এল। ধনু রাশির আড়ালে থাকা বামন তারাজগতটির এই সৌভাগ্য বেশিদিন রইল না। একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ম্যাগ ডেগের আসন টলমল করে উঠল। মিথুন রাশিতে পাওয়া গেল আর একটি নতুন তারাজগত।

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান সাইমন্স 'স্নিকার্স' নামের এই তারাজগতটিকে খুঁজে পান। ছায়াপথ থেকে মাত্র পঞ্চান্ন হাজার আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই তারাজগতটির কপালেও জুটল না নিকটতম পড়শীর সম্মান। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বিয়াল্লিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে সন্ধান পাওয়া গেল আরও একটি তারাজগতের। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে এই নতুন পড়শীর খোঁজ পাওয়া যায়। ইতালি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের জ্যোতির্বিদদের একটি আন্তর্জাতিক দল এই তারাজগতটির আবিষ্কারক।

এখানেই কি শেষ? যেভাবে একের পর এক নতুন নতুন তারাজগতের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই নতুন আবিষ্কৃত তারাজগতটিও নিকটতম পড়শী হওয়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারবে কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তারাজগতগুলি কিন্তু ছন্নছাড়াভাবে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। এরা রয়েছে দল বেঁধে। যেমন ছায়াপথ ও আরও পঁচিশটি তারাজগত মিলে গড়ে উঠেছে একটি আঞ্চলিক বা মহা তারাজগত। এই মহা তারাজগতগুলি আবার একটি সু-বৃহৎ তারাজগতগুচ্ছের এক একটি প্রতিনিধি। এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বন্ধনের মূলে রয়েছে নিউটনের মহাকর্ষ বল। এই বলের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে চলেছে। তারাজগতগুলিও এই নিয়মের বাইরে নয়। প্রতিটি তারাজগত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে চলেছে।

সৃষ্টির লগ্ন থেকে মহাবিশ্ব স্ফীত হয়ে চলেছে। এ ঘটনা আজ সকলের জানা। কারও কারও মতে অবশ্য এটি একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র। মহাকর্ষের টানে এই স্ফীতিশীলতা একদিন থেমে যাবে তারপর শুরু হবে বিপরীত মুখী দৌড়। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সব বস্তুই ছুটে যাবে পরস্পরের দিকে। আবার এক মহাবিস্ফোরণ। সব কিছু শুরু হবে আবার নতুন করে। শুরু হবে নতুন ব্রহ্মাণ্ডের পথ চলা। এই মহাবিশ্ব হবে স্পন্দমান মহাবিশ্ব (Pulsating Universe)।

পৃথিবীতে বিপন্ন জীবজগৎের কথা অনেকদিন ধরেই শুনে আসছি। মহাবিশ্বে যে বিপন্ন তারাজগত আছে একথা আমাদের কাছে অনেকটাই নতুন। আমাদের ছায়াপথের থেকেও বড় অনেক তারাজগত মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তাদের মহাকর্ষীয় টানে তাদের নিকটবর্তী ছোট তারাজগতগুলিও যে বিপন্ন একথা অনুমান করা যায়। পৃথিবীতে বিপন্ন প্রজাতিকে আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মহাবিশ্বের বিপন্ন তারাজগতগুলির জন্য আমাদের কিছুই করার নেই। বিজ্ঞানকে যতই আমরা আয়ত্ত্ব করি না কেন এখানে আমরা একেবারেই অসহায়। শুধু জানা ছাড়া কিছুই করার নেই।

লেখক : কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোঃ-৯৪৩৩১৪৫১১২

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোনঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ : ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন : ৯৪৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com